অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 48-54
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

সৌন্দর্যবোধ ও রবীন্দ্রমনীষা

রঞ্জন মান্না
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

মানুষ মাত্রই সৌন্দর্য বোধের অধিকারী। কবিদের ক্ষেত্রে এ কথা অনিবার্য ভাবেই চলে আসে কারণ তাঁরা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ মন ও মননশীলতায় চিত্তবোধকে লালন করে থাকেন। কবিগণ নির্লোভ, নিস্পৃহ, নির্মোহ, নিরাসক্ত জীবনবোধকে অবলম্বন করেই পথ চলেন। স্বভাবত কারণেই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্যময় দিকটি তাদের কাছে ভিন্নতর মহিমায় ব্যঞ্জিত হয়। জীবনের অনুষঙ্গ, ক্লেদ, গ্লানি, পাপ, পঙ্কিলতা, অন্যায়-অবিচার সমানভাবে কবিদের মনকে আলোড়িত করে। এই অর্থে কবিগণ সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি স্পর্শকাতর হন। কল্পনাপ্রবন ও আবেগের অনুসারী হয়ে থাকেন। এই সুবাদে কবিরা সৃষ্টিশীল চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। পৃথিবীর কোন মানুষই তার অবস্থানে সন্তুষ্ট নয়। সকলেই আরো অধিকতর সুন্দর হওয়ার নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত মানুষের মধ্যে একটা অতৃপ্ত সৌন্দর্যবোধ প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। কবিরা মূলত এই সৌন্দর্য সাধনায় জীবনপন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কবিগণ মানুষের নান্দনিক বোধকে একটি স্বপ্নমুখর জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌন্দর্যচচেতনা শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সৌন্দর্যচেতনা ছিল গভীর আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী। যেখানে তিনি প্রকৃতি, মানবপ্রেম, সত্য ও আনন্দকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে সৌন্দর্য মানেই সত্যের প্রকাশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং অরূপের মধ্যে রূপের অনুসন্ধান, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎকেঅতিক্রম করে পরম সত্ত্বার সঙ্গে মিলিত হয়। কবিদের কাছে সৌন্দর্যবোধ হল এক গভীর উপলব্ধি, যা কেবল বাহ্যিক রূপ নয় বরং প্রকৃতির অপার রহস্য, জীবনের অন্তর্নিহিত আনন্দ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব এবং মানুষের সৎকর্ম ও চিন্তার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে তাদের সৃষ্টিশীলতাকে চালিত করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্য ছিল এক ‘অনন্ত লীলা’, যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করার বিষয়, যা কবিকে পরম সত্যের দিকে চালিত করে। তাঁর সৌন্দর্যবোধ ইন্দ্রিয়লব্ধ আনন্দের ঊর্ধ্বে উঠে পরম সত্য ও চিরন্তন আনন্দকে স্পর্শ করতে চায়।

সাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের বিষয়টি বিশেষ চিন্তাভাবনার পরিচায়ক। শিল্প ও সাহিত্যের তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগ রীতিগত ক্ষেত্রে নন্দনকলার এক উচ্চতর স্থান রয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্য ভুবনে নন্দন তত্ত্বের বিষয়টি যে এক অন্যতর মাত্রা পাবে তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রসাহিত্য হল এক দর্শন। 'নন্দন' শব্দটির মধ্যেই 'আনন্দ' শব্দটি লুকিয়ে আছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই সৌন্দর্যচেতনা এবং আনন্দ ভাবনা বিশেষ দর্শনজাত হয়ে উদ্ভাসিত আর উন্মোচিত করেছে আমাদের মনন এবং চৈতন্যকে। রবি ঠাকুরের 'সীমা-অসীমের' তত্ত্বটি তাঁর কবিতা বা কথাসাহিত্যে বারেবারেই ঘুরে ফিরে এসেছে। 'সীমার মাঝে অসীম'- এর সুরটির মধ্য দিয়েই অন্তরের সৌন্দর্য চেতনাটি জাগ্রত হয়েছে। আর তাতেই তো কবির—'পথ-চাওয়াতেই আনন্দ'। বহিরঙ্গের শুষ্কতা, শূন্যতাকে সরিয়ে রেখে অন্তরঙ্গের সৌন্দর্যায়তনেই কবির—'মুক্তি আলোয় আলোয়'। এই আনন্দে যে নান্দনিক সৌন্দর্য তারই নাম রবি ঠাকুর। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের প্রতিটি ফসল ফলিয়েছেন সৌন্দর্যবোধকে হাতিয়ার করে। সুন্দরের সঙ্গ লাভ করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক পুন্যাত্মবান মহাপুরুষ।

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুন্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর
সুন্দর হে সুন্দর "।১

আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে আর এক ধ্যানমগ্ন 'আমি' রয়েছে। এই 'আমি'-ই আমার আমিত্ব। সেই ধ্যানমগ্ন 'আমি'-কে সুন্দর করে তুলতে হয়। সেই 'আমি'ই হল আমার 'মন'।—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর
সুন্দর হল সে।"২

'পান্না' সবুজ। কিন্তু কে বলে পান্না সবুজ? কে বলে গোলাপ সুন্দর? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন আমার মন বলে তাই পান্না সবুজ, আমার চেতনা বলে তাই গোলাপ সুন্দর। আমার চোখে যদি কালো চশমা থাকে তাহলে আমি সবকিছুই কালো দেখব, কিন্তু আমার চোখে যদি সুন্দরের চশমা

.

থাকে তাহলে সকলেই হয়ে উঠবে কত সুন্দর, কত মধুর। রবি ঠাকুর বলেন চোখে লাগাও সুন্দরের চশমা। তাহলেই একটা কুৎসিতের মধ্যেও যে সৌন্দর্য রয়েছে তাও তুমি খুঁজে পাবে। পশ্চিমের যাত্রী ডায়েরীতে রবিঠাকুর সুন্দরের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—"সৃষ্টিতে যতক্ষণ দ্বিধা থাকে ততক্ষণ সুন্দর দেখা দেয় না। সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই সুন্দরের আবির্ভাব হয়"।৩ চিরন্তন জগৎ, পরম সত্য ও সৌন্দর্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইনের আলাপচারিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কথোপকথন বলে পরিগনিত। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল—'সত্য ও সৌন্দর্য মানব অস্তিত্ব নিরপেক্ষ কিনা?' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—'চিরন্তন জগতের সকল সত্য প্রকৃত পক্ষে মানবসত্য। অন্যভাবে বললে বিশ্বজনীন সত্য হল মানবিক সত্য। কাজেই মহাবিশ্ব যখন মানবচেতনার ঐকতানে একীভূত হয়, যা চিরন্তন রূপ নেয়, তখনই তাকে সত্য বলে মানি এবং সৌন্দর্য হিসেবে অনুভব করি। কাজেই সত্য ও সুন্দর মানবচেতনা নির্ভর'।৪ আইনস্টাইন সৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে একমত হলেও সত্যের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন—'মানুষের অনুপস্থিতিতে অ্যাপলো ভেলভেদরকে কি সুন্দর বলা যাবে না? তিনি বলেন—সত্য সর্বদা মানব পর্যবেক্ষনের উর্ধ্বে হতে হবে। যেমন পিথাগোরাসের সূত্র এমনিতেই সত্য। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সত্য মানবচেতনা নির্ভর সত্য। দৃশ্যমান অনুভূতি মানবচেতনারই অংশ। মানবসত্য তখনই কেবল সত্য যখন মানবচেতনা ও বিশ্বচেতনা এক হয়ে যায়। এই সত্য মানুষের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্য ও সত্য এক ও অভিন্ন। তিনি বলেন—'Beauty is truth, truth beauty'৫ অর্থাৎ সৌন্দর্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য।

মাতৃভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী, আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবীর অপরূপ রূপ মহিমায় কবির হৃদয় নৃত্যরতা, অন্তহীন সৌন্দর্যের এক লীলাক্ষেত্র। মর্তের প্রতি কবির ছিল সুগভীর আকর্ষণ ও অকৃত্রিম প্রেম। এই আকর্ষণের প্রধান কারণ তিনি ছিলেন অদ্যন্ত মানবপ্রেমিক—

" মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"।৬

মর্তের প্রতি কবির আত্মিক যোগাযোগ যে কত গভীর ও নিবিড় তার পরিচয় পাওয়া যায় 'ছিন্নপত্র'-এর একটি চিঠিতে—"... যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি—ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ,কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা সমস্তটা শুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমনকি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম?"৭ এই মর্তপ্রেম ও মানবপ্রেম হল রবীন্দ্র জীবনদর্শনের মূল সুর।

.

কবির 'মানসী' কাব্যগ্রন্থটি একটি অতি উৎকৃষ্ট ও অতি অপূর্ব গ্রন্থ। এত চরম সৌন্দর্যের ও এত বিচিত্র কবিতার একত্র সমাবেশ বাংলা সাহিত্যে বিরল। সৌন্দর্য অনুভবে মানুষের জন্ম এবং সুন্দর অভিব্যক্তিতে তার বিকাশ। এই কাব্যের ভিতর এমন অনেক কথা আছে যা পাঠে আমাদের হৃদয় অন্ধ-রুদ্ধ গৃহ হতে বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হয়ে যায়। জগত সংসারের মাঝে সংসার রচনা করে সমস্ত মানব হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত হয়। আবার এমন অনেক কথা আছে যেখানে হৃদয় নিজের প্রচ্ছন্নতর অন্তঃপুর মধ্যে সেই কথার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। কবিতা আর নারী এই দুই কবির কাছে এক। রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখেছেন কবিতা রূপে, কবিতাকে দেখেছেন নারী রূপে। মনের অলংকারে অলংকৃত করে কবিতা আর নারী এই দুইকেই আমরা সুন্দর করে পেতে চাই। কবিতা আর নারী দুই আজন্ম সাধনার ফল, দুই কল্পনা লতা। তারা শারীরিক ভাবে সব সময় ধরা না দিলেও তারা ধরা দেয় আমার চেতনায়, কল্পনায়, আত্মায়। 'মানসী' কাব্যে মানসীর রূপের মধ্যে মানসী ও প্রকৃতির এক অবিমিশ্র আদান-প্রদান লক্ষ্য করা যায়। প্রিয়তমার রুপবয়ব রচিত হয়েছে প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য চয়ন করে। মানবের চিত্রকল্প দিয়েই প্রকৃতির রূপ নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই কাব্যে প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যে কবির মানসসুন্দরীর রূপসৌন্দর্য চিরদিনের মতো একাকার হয়ে গেছে। তাই কবি বলেন—

" শত শত প্রেম পাশে টানিয়া হৃদয়
একি খেলা তোর।
ক্ষুদ্র ও কোমল প্রাণ, ইহারে বাঁধিতে
কেন এত ডোর।
ঘুরে ফিরে পলে পলে
ভালোবাসা নিস ছলে,
ভালো না বাসিতে চাস
হায় মনচোর।
হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিষ্ঠুর প্রকৃতি।
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধগান,
কোথায় পিরিতি।
আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাদিয়া মরি
এ কেমন রীতি" ।৮

যে মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই, যে মৃত্যু মানেই ভয়ংকর, বীভৎস সেই মৃত্যুই রবীন্দ্রনাথের কাছে কত সুন্দর, কত স্নেহময়, কত মধুমাখা। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-র পাঠক মাত্রই আমরা জানি—'মরণ রে তুঁ হুঁ মম শ্যামসমান'।৯ সৌন্দর্যের প্রাণালোকে শ্যামের সঙ্গে এক করে নিলেন মৃত্যুকে। মৃত্যুকে তিনি বরণ করেছেন সত্যরূপে। মৃত্যুতেই কি জীবনের পূর্ণচ্ছেদ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলবেন—না, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ঘটে আর এক নতুন জীবনের সূচনা। 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীকধর্মী নাটক। সমস্ত নাটকটি জুড়ে বিষাদ- মধুর রাগের অব্যক্ত আলাপ অনুভব করা যায়। বদ্ধপ্রাণের ব্যাকুলতা বিধৃত হয়েছে। অমল এই মিলনোৎসুক আত্মার প্রতীক। বিশ্বপ্রকৃতি তার উদার ব্যাপ্তি নিয়ে, অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে অমলকে হাতছানি দেয়। সংসারিক আবিলতার মধ্যে অমলের আনন্দ পিয়াসী সত্তা হাঁফিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তাকে বাঞ্ছিত মুক্তি এনে দেয়। অমল মারা যায়নি, অমল ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে হারিয়ে যায় মৃত্যুর ভয়ংকরতা, বরং মৃত্যু হয়ে ওঠে চির প্রশান্তিময়, জাগবার পূর্বপ্রয়াস। 'রক্তকরবী' নাটকে রঞ্জনের রক্তমাখা ধুলো আঁচলে তুলে নিয়ে নন্দিনী বলে—

" পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয় আয় আয়
ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায় "।১০

ধুলো মানুষ পায়ে মাড়িয়ে চলে। আর আঁচল তা আহ্বান জানায়, সন্তানের বিশ্রামের, ভরসার স্থল হয়ে ওঠে। নন্দিনী রঞ্জনের সেই রক্তমাখা ধুলোকে আঁচলে তুলে নিয়ে সংগ্রামের ডাক দেয়। সেই ধুলো মূল্যবান হয়ে উঠেছে কারণ তাতে যে যুক্ত হয়েছে প্রাণপুরুষ রঞ্জনের রক্ত। আসলে রঞ্জনের এক বিন্দু রক্ত যে বিফলে যাবেনা, তা যে সাধারণ জনতার সংগ্রামের প্রেরণা তাকেই প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মৃত্যু এভাবে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ না হয়ে বরং হয়ে ওঠে নতুন জীবনের আলোকদ্বার। ঠিক এভাবেই প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্যবোধ ঘিরে রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। আর রবীন্দ্রনাথ ঘিরে রয়েছেন আমাদেরকে, আমাদের মনকে, আমাদের জীবনকে।

পাশ্চাত্যের যে প্রত্যক্ষবাদ বা মানবতাবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, রবীন্দ্রনাথ তার সমর্থক ছিলেন না। তাঁর 'শান্তিনিকেতনের'-এর রচনাগুলিতে যে মহামানব প্রসঙ্গ উত্থাপিত তা বিমূর্ত কল্পনা মাত্র নয়। মানুষের মধ্যে যে গুণাবলীর প্রকাশে মানুষ মানুষ রূপে পরিগণিত হয়, সেই মানবগুণাবলী বা মনুষ্যত্বের জাগরণকেই রবীন্দ্রনাথ মহামানবের রূপকল্পে চিত্রিত করেছেন। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে যে ইশ্বর কল্পনা তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছিল, সেই ঈশ্বরের অবস্থান মানুষের অন্তঃস্থলে। যে অন্তর্যামী সত্তা, নানা পর্বে উচ্চারিত তা প্রকৃতপক্ষে 'মনের মানুষ' তত্ত্বের দ্বারা

.

প্রভাবিত। এই মানবতাবোধ তথা মহাপুরুষের অধিষ্ঠান উপনিষদের ভাষায় 'সদা জনানাংহৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। 'চিত্রা' কাব্যের সূচনাতে তিনি লিখেছেন—"আমার একটা যুগ্ম সত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, যে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত। তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্পপূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখ দুঃখে আমার ভালোয় মন্দয়।"১১ উপনিষদের তত্ত্বের সঙ্গে বাউল ধর্মের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আমি কোথায় পাবো তারে' গানটি উল্লেখ করেন অক্সফোর্ডের এক বক্তৃতামালায়। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তিনি চান না। এই ভাবনাই প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ভাবনা এবং সত্য সম্বন্ধীয় তত্ত্বকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিক নন, নন্দনতাত্ত্বিক। সাহিত্য কী? তার স্বরূপ কী? সাহিত্যের মধ্যে কবি কোন বিষয়টিকে খোঁজেন? যে সুন্দরের উপাসনা আমরা করি, যে সুন্দরকে আমরা খুঁজি, সাহিত্য সুন্দর্য বলতে কী বোঝে? রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে সেই নন্দনতাত্ত্বিক মনের পরিচয় দিয়েছেন বারবার। 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে তিনি বলতে চেয়েছেন আমরা তাকেই সুন্দর বলব যা আপাতভাবে চর্মচক্ষের সুন্দর নয়, যার মধ্যে একটা মঙ্গলের ধারণা আছে, যা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর তাই সুন্দর। 'রাজা-রানী' নাটকে রাজা বিক্রমদেবের ভালোবাসা সুন্দর নয়, রানী সুমিত্রার ভালোবাসা সুন্দর। এই নাটকে কুমার এবং ইলা-র ভালোবাসা সুন্দর। রাজা বিক্রমদেবের সঙ্গে সুমিত্রা কিংবা কুমার ইলার মানসিকতার পার্থক্য এখানেই রাজা বিক্রমদেব তাঁর ভালোবাসাকে কল্যাণবোধ থেকে সরিয়ে রেখে একটা আত্মসুখের মায়াজালে বেঁধে ফেলেছেন। একজন রাজা হয়েও তিনি যেভাবে প্রজাদের কল্যাণের থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন, আপন সুখের জন্য প্রেমকে দেখেছেন, সেখানেই তাঁর প্রেম সুন্দর নয়। কালিদাসের লেখনীর মধ্যে যে ভারতীয় দর্শন, কল্যাণের ধারণা লুকিয়ে রয়েছে, রবীন্দ্রদর্শনকে তা প্রভাবিত করেছে। 'শকুন্তলা' নাটকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন কেন দুর্বাশা মুনি শকুন্তলাকে অভিশাপ দিলেন। অভিশাপ দেওয়াইতো সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল। শকুন্তলা তার দায়িত্ব, কর্তব্য থেকে বিরত হয়ে পতিচিন্তায় মগ্ন হয়ে অতিথি আপ্যায়ন ভুলে যায়। এই যে তার প্রেম কল্যাণ ধর্ম থেকে, মানবসেবার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এখানেই তো সেই প্রেম সৌন্দর্যতা হারিয়েছে। তিনি চর্মচক্ষুতে দেখা সৌন্দর্যের অন্তরালে একটা গভীর সৌন্দর্যের পরম সত্যতাকে উপলব্ধি করেছেন। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য দেখতে পেলে তার সৌন্দর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারা যায়।—'সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ'।১২ যা সত্য তাই মঙ্গলজনক। আর যা মঙ্গলজনক তাই হল সুন্দর। আর এখানেই সত্য-শিব-সুন্দর এক হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

১। গীতবিতান, পূজাপর্যায়।
২। সঞ্চয়িতা, তুলি-কলম, পৃ-৬৫৩
৩। পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ-১৫২
৪। রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌন্দর্যবোধ, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ-১৫৬
৬। সঞ্চয়িতা, তুলি-কলম, পৃ-২৮
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্র সংখ্যা-১৮
৮। সঞ্চয়িতা, তুলি-কলম, পৃ-১৩৫
৯। সঞ্চয়িতা, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, পৃ- ১৭
১০। রক্তকরবী, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, পৃ-৫১
১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ।
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌন্দর্যবোধ, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ-১৫২

গ্রন্থপঞ্জি

১) গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিস্কার, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
২) ঘোষ, ড. অজিত কুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৩) চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুহাঁস (সম্পাদিত), মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, চতুর্থ সংস্করণ, তুলি-কলম, কলকাতা-৯।
৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পৌষসংস্করণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম, আষাঢ় ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী।
৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।
৮) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী, পঞ্চম সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
৯) মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
১০) মজুমদার, মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩।
১১) মিশ্র, ড. আশোককুমার, নন্দনতত্ত্বের রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

cc BY NC